রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলন ও বঙ্গীয় নারী সমাজের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড: সুতপা ভট্ট

১৯৩১ সালের ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হয়। যদিও এই আন্দোলনের সঙ্গে বহু মানুষ সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিল। এই আন্দোলনেই সর্ব প্রথম অভিজাত থেকে সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই আন্দোলনই প্রথম মেয়েদেরকে কোন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হবার পর, কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্বরা ও গ্রেপ্তার হবার পর সরোজিনী নাইডু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এসময় সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বাংলার বহু জায়গায় সক্রিয়ভাবে নারীরা আন্দোলনে অংশ নেয়।

গান্ধীজী ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। এই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলে আইন অমান্য আন্দোলন এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্যায়ে (১৯৩২-৩৪) আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র গতিতে শুরু হয়েও মাঝামাঝি পর্বে তার গতি হারায়। যদিও এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা আরও সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। সমগ্র ভারতের মত বাংলার সব স্তরের সব শ্রেণীর নারীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে ক্রমশ এই আন্দোলন তার অপন নিয়মেই গতি হারায় তবুও বহু নারী যারা এই সময় আন্দোলনে যোগ দেন তারা সবাই আবার অতীতের নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ধারা মেনে ফিরে যাননি গৃহকোণে। এদের অনেকেই এই সময়কার অন্যান্য প্রথম সারির নারী নেত্রীদের মত সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। অনেকে আবার সমাজ সেবার সাথে নিজেদের যুক্ত করেন।[১]

ইতিমধ্যেই গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সামনে রেখে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা রাজদ্রোহ আইন অমান্য[১ক] করার ডাক দিয়েছেন। ''১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত দশটার যুগপৎ আক্রমণ আরম্ভ হল টেলিগ্রাফ অফিসে, অস্ত্রাগারে, পুলিশ ব্যারাকে। লাঙ্গলকোট ও ধূমের কাছে রেলের লাইন তুলে ফেলা হল।'' [২] এই ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য সেন। [৩] এই বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করল ব্রিটিশের ক্ষমতার প্রতীক অস্ত্রাগার। দখল নিল ব্যারাকের। এরপর বিপ্লবীরা আশ্রয় নেয় জালালাবাদ পাহাড়ে। ''২২ এপ্রিল জালালাবাদের

পাহাড় সুসজ্জিত ও সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে আবার তাদের সাক্ষাৎ হয় বিকেল সাড়ে চারটেয়। বিপ্লবীরা জালালাবাদের পাহাড়ে -- তারই সামনে উঁচু পাহাড়ে মেশিনগান নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। মেশিনগানের গুলিতে প্রথম চোটেই বিপ্লবীদের ১১ জন নিহত হয়, ৪ জন হয় গুরুতর ভাবে আহত।'' [৪] -- হয়। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ সমগ্র বাংলার ও সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের মনে এক গভীর রেখাপাত করে। এই ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার নেতৃত্বই প্রথম মেয়েদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করার ও নেতৃত্ব দেবার সুযোগ করে দেয়। আর মেয়েরাও নিজেদের ত্যাগ - নিষ্ঠা - পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময় পর পর বহু মেয়েকে পাওয়া যায় যারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই পর্বেই বহু মহিলা বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন, এদের মধ্যে অনেকের আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হয়। এই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা প্রাপ্ত মহিলা বন্দীদের পাশে এসে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজ সাহেব, পরবর্তী কালে গান্ধীজী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের উদ্যোগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৩ সালের শ্বেতপত্রের ভিত্তিতে লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে নিযুক্ত কমিটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন রচনার দায়িত্ব পায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুসারে ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন হয়। এই ভারত শাসন আইনের ''প্রকৃত ফল ছিল কংগ্রেসের দৃষ্টিকে প্রদেশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া আর কেন্দ্রে শক্তিশালী সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।'' [৫] ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের প্রকাশিত ইস্তাহারে অন্যান্য অনেক প্রস্তাবের সাথে একথা খুব স্পষ্টভাবে থাকে যে, সমস্ত রকম দমন পীড়ন মূলক আইন রদ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এসময় ''বাংলার বহু যুবক ও তরুণী আইন-অমান্য আন্দোলনের পর হইতে বিপ্লবাত্মক কর্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বিনা-বিচারে বন্দী বা আটক হইয়াছিলেন আবার অনেকে বিপ্লবাত্মক কর্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বিনা বিচারে বন্দী বা আটক হইয়াছিলেন।''[৬] এসময় সমগ্র ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে জয়ী কংগ্রেস শর্তাধীন মন্ত্রী সভা গঠন করে সমস্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেও বাংলার সরকার তা করেনি। বাংলার মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রীসভা এই বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে ছিল নীরব। ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে আন্দামানে বন্দী বিপ্লবীরা প্রায় ১৮৭ জন মিলে মুক্তির দাবীতে অনশন শুরু করে। এসকল রাজনৈতিক বন্দীদের দাবী ছিল -- (ক) তাদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনা, (খ) রাজনৈতিক বন্দী সকলকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা (গ) সকলের মুক্তি -- এই তিন দাবি জানিয়ে অনশন শুরু করে দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্ত জেলখানার বন্দীরাও এঁদের প্রতি

সহানুভূতি জানিয়ে অনশন শুরু করে।[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১০ আগস্ট দেউলী বন্দী নিবাসে ও ১২ আগস্ট আলিপুর জেলের বন্দীরাও মুক্তি ও রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।[৮] এসময় জনগণও এই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে গড়ে তুলল। এমনকি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। ২ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।''[৯] গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন, ''রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য।[১০] তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে জনপ্রতিনিধিগণ শাসন রশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শুধু বাংলাদেশেই শত শত যুবক এখন বিনা বিচারে আবদ্ধ আছে।''[১১] এসময় বাংলার প্রাদেশিক সরকারের কাছে রবীন্দ্রনাথ আবেদন করেন ''বাংলার গবর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ, তাহারাও বোম্বাই মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গবর্নমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা ও সহানুভূতির সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বিবেচনা করুন।''[১২] এই উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রলীগের যুগ্ম উদ্যোগে পরিচালিত বিশাল ছাত্র মিছিল শহর পরিক্রমা করে টাউন হলের সভায় যোগ দেয়।''[১৩] এই বন্দী মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার আন্দোলন সক্রিয় ভাবে বিকাশ লাভ করল তা হল ছাত্র আন্দোলন। এসময় টাউন হলের সভা শেষ হলে ''রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে আন্দামান রাজনৈতিক বন্দি সাহায্য সমিতি গঠিত হয় ..... অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য গণ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৪ আগষ্ট আন্দামান বন্দী মুক্তি দিবস রূপে পালিত হয়। ছাত্রীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট হয় সারা বাংলায়।''[১৪] ১৪ আগস্ট আন্দামান বন্দীমুক্তি দিবস পালনের জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ আহ্বান জানান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আসরাফুদ্দিন, সহসভাপতি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা গুণদা মজুমদার, বঙ্গীয় লেবার পার্টির সম্পাদক কমলা সরকার, কমিউনিস্ট পার্টির মুজফ্ফর আহমেদ,বঙ্কিম মুখার্জি, রায়পন্থী শ্রমিকনেতা রজনী মুখার্জি, সি পিএম এফের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জি। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি বন্দীমুক্তি সাব কমিটি গঠন করে। ধর্মঘট করে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেয় প্রায় ১০ হাজার ছাত্র ছাত্রী। তারা এসে যোগ দেয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভাতে।[১৫] এরপর ''২৮ আগষ্ট ছাত্র ধর্মঘট হয় সমগ্র বাংলাদেশে। ঐ দিন কলকাতায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, সভাপতিত্ব করলেন ছাত্র নেতা নন্দলাল

বসু।[১৬] এই সভাস্থল থেকে দাবী জানান হল ''জাতীয় কংগ্রেসকে সক্রিয় সমর্থন জানাতে হবে ছাত্রদের এই আন্দোলনকে।''[১৭] এই আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এসময় গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এগিয়ে আসে। এসময় ''রাজবন্দী ও কারাদন্ডিত বন্দিদের মুক্তি দান কল্পে মহাত্মাজী তাঁহাদের এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু কাল আলাপ - আলোচনা রত থাকেন।''[১৮] এরপর বাংলার সরাকর প্রতিশ্রুতি দিল ''প্রথমোক্ত দাবী দুটি তাঁদের পূরণ করা হবে -- মুক্তির দাবী বিচার করা হবে পরে।''[১৯] বন্দীদের আন্দামান থেকে আনা শুরু হল ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে।[২০]

১৯৩৮ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলন আরও তীব্র হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রেভারেন্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজ প্রবল ভাবে চেষ্টা করেছেন বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কল্পনা দত্তর বাবাকে গুরুদেব লেখেন ''তোমার কন্যার জন্য যা আমার সাধ্য তা করেছি, তার শেষ ফল জানবার সময় এখনও হয়নি; আশা করি চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।[২১] একই ভাবে এণ্ড্রুজ সাহেব চিঠিতে লেখেন, ''আমি যাচ্ছি গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করতে তোমার মেয়ের জন্য। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরো যাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়।''[২২] এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বন্দীমুক্তির আন্দোলন পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে শুরু করার পর ১৯৩৮ সালের ১৪ মার্চ সারা বাংলা বন্দীমুক্তি দিবস পালিত হয়।[২৩] কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন এই আন্দোলনে। কলকাতার টাউন হলের সমাবেশে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, ''যতদিন একজনও রাজনৈতিক বন্দী কারারুদ্ধ থাকবেন, ততদিন আমাদের এই বন্দীমুক্তি আন্দোলন থামবে না।''[২৪] এসময় গান্ধীজী অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন, এসময় তিনি বিভিন্ন জেলে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন, ''গান্ধীজী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেছেন।[২৫] এসময় বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ''গান্ধীজী কল্পনা দত্তকে বললেন;'' নাজিমুদ্দিন তোমার উপর অসম্ভব খাপ্পা, এবং চট্টাগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাউকেই মুক্তি দেওয়া হবে না। তবুও আমি চেষ্টা করছি, তোমাদের মুক্তির জন্য।''[২৬] বাইরে তখনও এই বন্দীদের মুক্তির জন্য জোরদার গণআন্দোলন চলছে। ''গান্ধীজী আলোচনা চালিয়েছেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে।''[২৭] ''১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নিল যে, একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী দন্ড প্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীরা ছাড়া, আর সমস্ত বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ও দন্ডপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের সরকার বিনা শর্তে মুক্তি দেবে।[২৮] ১৯৩৮ সালে সমস্ত রাজবন্দী (বিনা বিচারে আটক) মুক্তি পায়।[২৯] কল্পনা দত্তের স্মৃতি চারণ থেকে জানা যায় ''১৯৩৯ সালের ১ মে, গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার আমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।''[৩০] এখানে আমাদের বলতে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের কথাই বলা হয়েছে।

১৯৩৭ সালে শুরু হওয়া এই বন্দীমুক্তি আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এই আন্দোলন প্রথম আন্দোলন যা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে হয়। যেখানে মূল আন্দোলন গড়ে তোলে বাংলার ছাত্র সমাজ একই সাথে যোগ দেয় তাতে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এমনকি বিদেশী রেভারেন্ট সি. এফ. এন্ড্রুজ-এর মত মানুষ। এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি মহিলারা না হলেও পরোক্ষ ভাবে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দী মেয়েরা ও বিপ্লবী মেয়েরা এই আন্দোলনের প্রেরণা দাত্রীর ভূমিকা নেন, সে কারণেই বীণা দাশের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ''যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, মা-বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময় যাদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয় -- তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন এন্ড্রুজ।''[৩১] ক্রমশ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জাতীয় কংগ্রেস। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নিজে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী তোলেন। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গান্ধীজী জেলে গিয়ে বন্দীদের সাথে দেখা করেন কথা বলেন, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্তর মত সাজা প্রাপ্ত বিপ্লবী কর্মী ও নেত্রীদের সাথে। এই আন্দোলনের সময় তিনি সরকার পক্ষের স্বরাষ্ট্র সচিব নিজামউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই আন্দোলনের প্রথম পর্বে ''১৯৩৭ সালের ৮ আগস্ট লীলা নাগের কারামুক্তি ঘটে।''[৩২] ভারতের প্রথম মহিলা ডিটউনিউ মুক্ত হন। এই সামগ্রিক আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা ছাড়া আর সমস্ত বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের বিনা শর্তে সরকার মুক্তি দেবে। এই বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বহু শিক্ষিতা তরুণী-ছাত্রী আন্দোলনে যুক্ত হন। আর মুক্তি প্রাপ্ত নারী নেত্রীরা নতুন করে মেয়েদের সংগঠিত করে বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে আরও বহুধা বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক করে তোলেন। রেণু চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, ''বৃটিশরাজ 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে যে সব বিপ্লবীদের জেলবন্দী রেখেছে তাঁদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং মেয়েরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে কিছু বন্দী ছাড়া পেলেন কিন্তু অনেকেই জেলখানায় আটকে রইলেন। নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মেয়েরা এই বন্দী মুক্তি আন্দোলনে একত্রে সমবেত হলেন। মেয়েদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত মেয়েদের প্রথম পথসভা হল গড়িয়াহাটে।[৩৩] এই পথসভাকে কেন্দ্র করে জনমনে এক বিরল উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দ্বারা সংগঠিত এই পথসভার বক্তারাও সকলেই ছিলেন নারী। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এসকল নারীদের তেজদৃপ্ত বক্তৃতা শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। এপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জীর স্মৃতিচারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ''এই

আন্দোলনের ভিতর দিয়েই সর্বপ্রথম অসংখ্য স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন কমিটি গড়ে উঠল। এগুলোই হয়েছিল ভবিষ্যতে ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাপক ও শক্তিশালী সংগঠনের ভিত্তি।''[৩৪] এই আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী নারীরা এতটাই একাত্ম হলেন যে, তারা সবাই একত্রে ৯৮ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা অফিস খোলা হয়। ওখান থেকেই মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আন্দোলনে সংগঠিত করতেন। একত্র হয়ে সকলে মিলে কংগ্রেস মহিলা সংঘ গড়ে তুললেন। ওতে ছিলেন শ্রীসংঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীণা দাস ও কমলা দাসগুপ্ত। যুগান্তরের ভূতপূর্ব সদস্য কমলা চ্যাটার্জী যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য হলেন এবং আরও নানা মতের মেয়েরা। সম্মিলিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।''[৩৫] এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতি প্রথম তার সংকীর্ণ গন্ডী ছেড়ে বৃহৎ হল প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠল জাতীয় আন্দোলন, যেই আন্দোলনে সামিল হল ভারতের ছাত্ররা - ছাত্রীরা, রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজ এর মত অরাজনৈতিক মানুষেরা, সাথে জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজী স্বয়ং এবং সুভাষ চন্দ্র বসু। যেখানে বিপ্লবী কর্মী মূলতঃ বিপ্লবী মেয়েদের আন্দামানে পাঠালো বন্ধ করার সাথে তাদের মুক্তির দাবী উঠল, যেখানে বিপ্লবী কর্মীদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে এনে দেশের জেলে রাখার কথা বলার সাথে তাদের মুক্তির দাবীতে সবাই একত্রিত হয়ে আন্দোলন করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় -- অবশেষে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পান।[৩৬]

ফিরে এসে এরা সমৃদ্ধ করেন বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় ধারা রাজনীতিকে। যদিও নির্বাচনে ''অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার অনুমতি চাইলেন এবং গভর্নর, তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করলেন।''[৩৭] তা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ এসকল মানুষকে অভিমানী করে তুলল, নিষ্প্রভ হল ভারতের রাজনীতি তারা হারাল তাদের এই উৎসর্গীকৃত প্রাণ সন্তানদের। মুক্ত এই বন্দীদের বিপ্লবী কর্মীদের একটা বড় অংশ যোগ দিল কমিউনিস্ট পার্টিতে আর অপর অংশ যোগ দিল জাতীয় কংগ্রেসে। নারী আন্দোলন আরও বিকশিত হল এসকল মেয়েদের সক্রিয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগদানের ফলে। ক্রমশঃ কমিউনিস্ট মেয়েরা মেয়েদের নিজেদের দাবী দাওয়াকে সামনে রেখে সংঘবদ্ধ হল যেখানে পরে যোগ দিল কংগ্রেস-এর মহিলা নেত্রীরা বীণা দাশ, আশালতা সেন, নেলী সেনগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়াও ফরওয়ার্ড ব্লকসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল নারীরা, বিমলপ্রতিভা দেবী, হেমপ্রভা দেবী, লাবণ্যপ্রভা দেবী, লীলা রায় প্রমুখ নারীরা অনুপ্রাণিত করল পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের, এরা দৃষ্টান্ত গড়ল দলমতের উর্ধ্বে উঠে দেশকে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সবার আগে স্থান দিয়েছেন। এদের এই কাজ প্রভাবিত করল অসংখ্য নারীকে। ফলে পরবর্তীকালে নারী সংগঠন গড়ে তুলতে মহিলা নেত্রীদের খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। নবচেতনায় জাগ্রত এই নারীদের পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন নারী সংগঠনের সক্রিয়কর্মী হিসাবে সুচারুভাবে ত্রাণের কাজ করেন।

বিপ্লবী আন্দোলন নারীকে করল আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন। মেয়েরা বিপ্লবের কার্যে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, পিস্তল চালানো, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ি চালানো। তবে মেয়েদের শরীরচর্চা শিক্ষা ও লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে বিতর্কও ছিল। এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে অনুশীলন দলের নেতৃত্বের মধ্যে মেয়েদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সারদাচরণ চক্রবর্তী উদ্যোগী হলে তাঁকে উচ্চতর নেতৃত্বের রোষের সম্মুখীন হতে হয় এবং দলের তরফ থেকে তাঁকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়। [৩৮] এই সময়ের থেকে এগিয়ে যুগান্তর দলও নারীদের সম্পর্কে প্রগতিশীল হওয়ার কারেণ বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৩৯] যদিও বিপ্লবী আন্দোলন তথা সমিতিগুলো গড়ে ওঠার সময় প্রমথ নাথ মিত্র স্বয়ং সতীশচন্দ্র বসুকে অনুশীলন সমিতিতে একটি মহিলা সংগঠন তৈরী করে তার কার্যের দায়ভার গ্রহণ করতে বলেছিলেন, যা তখন বিভিন্ন কারণ বশতঃ সম্ভব হয়নি।[৪০] যদিও নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নারী বিপ্লবী দলের সভ্য হয়, এবং অস্ত্রচর্চা ও শরীরচর্চার অধিকার পায়, যা নারীকে করে আপন বলে বলীয়ান ও আত্মবিশ্বাসী। কমলা দাশগুপ্ত ''লাঠি খেলা''[৪১] শিখেছিলেন ''বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের''[৪২] কাছে। এই সব প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা ক্রমশ বিপ্লবী দলে যোগ দেবার জন্য ও বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে। বিপ্লবী দলে যোগদানকারী নারীরাই প্রথম নিজেদের যোগ্যতা ও পারদর্শীতার মাধ্যমে বাস্তবিক লিঙ্গ বৈষম্যের উর্দ্ধে উঠে ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজে সমানধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে, বাধা পেয়েছেন নিজেদের পরিবারের কাছের মানুষদের থেকে আবার আঘাত করেছেন তাদেরই, কমলা দাশগুপ্তর কথায়, ''ওদিকে আমাদের বাড়িতে চলেছে প্রলয় কাণ্ড। বাবা তাঁর বড়ো কন্যাকে অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্টে বড়ো করে তুলেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সে। কিন্তু কেমন যেন বিগড়ে গেছে মেয়ে। বি.এ. পাস করার পর থেকেই সে বদলে যাচ্ছে। আতঙ্কে আশঙ্কায় তিনি আর বাঁচেন না। মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করার আকাঙক্ষা যতই বাবা-মার মনে জোর পেতে লাগলো, মেয়ে ততই বেঁকে বসতে থাকলো। অশান্তির আগুন কাকে বলে তার সঙ্গে হতে লাগলো পিতা-পুত্রীর নিত্য পরিচয়।[৪৩] এই সময় মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক সহজাত মমতাময়ী রূপের বিরুদ্ধে গিয়ে হয়েছেন কঠোর দেশের কাজের জন্য নিজেদের পরিবারকেও পিছনে ফেলে রাখতে দ্বিধা করেনি, যা মেয়েদের দৃঢ়চেতা, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। এসময় তারা লিঙ্গ বৈষম্যের মূলে আঘাত করার জন্য পিছপা হননি নিজের জীবন দিতে, ''প্রীতির আত্মহত্যার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে।''[৪৪] নিজেরা দৃঢ় ভাবে বৈপ্লবিক কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য অবিচল থাকার জন্য যেমন আঘাত করেছিল কাছের মানুষদের ঠিক তেমনি ভাবে নিজেরাও দীর্ণ

হয়েছিল প্রগাঢ় মানসিক দ্বন্দ্বে। তা ভালভাবে জানা যায় বীণা দাশের কথায়, ''মনে তার একটা দুর্বলতা ছিল ঃ আমার মা-বাবাকে নিয়ে, কেবলি মনে হচ্ছিল ওঁরা কি ভাববেন, কি করে সহ্য করবেন।''[৪৫] আবার কখনও বা তিনি বলেছেন, ''মা- বাবার সঙ্গে লুকোচুরি করছি, তাঁদের কত বড় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করছি, এটা সহ্য করাই ছিল আমার পক্ষে সবচেয়ে শক্ত।''[৪৬] আবার একই সাথে এরা ছিলেন নিজেদের দেশপ্রেমে অটল, দলের প্রতি বিশ্বস্ত। শত প্রতিবন্ধকতাও তাদের নিজেদের কাজের সংকল্প থেকে ফেরাতে পারেনি। ''বাবা শুধুই কাঁদতে লাগলেন। মা সামনে যাকে পেলেন তারই হাত ধরে ব্যাকুল প্রার্থনা করতে লাগলেন।''[৪৭] এই সব মেয়েরা খুলে দিল নারী মুক্তির নতুন দিগন্ত, ভেঙ্গে দিল মেয়েরা ''ভীতু, পুরুষের তুলনায় অসমর্থ, প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে না'' এই মতটিকে। যদিও "they were not regarded by all us "respectable" women. Gandhi called them "unsexed".[৪৮] যদিও সমসাময়িক সমাজ এদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে এদের অভিহিত করেছিল অগ্নিকন্যা রূপে। এদের বীরত্ব প্রভাবিত করেছিল আরও অনেক মেয়েকে যাদের সবাই হয়ত বিপ্লবী কাজে যোগ দেয়নি কিন্তু পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল। সমগ্র ভারতবাসীকে যারা গর্বিত করেছিল সেই সব তরুণী বিপ্লবী মেয়েদের দীপান্তরের সাজা রোধ সহ মুক্তির দাবীতে গড়ে তুলল বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলন।

কল্পনা দত্ত, কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাশ সহ অন্যান্য কারাদন্ড প্রাপ্ত মেয়েদের মুক্তির দাবিতে গড়ে উঠল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলন। মূলতঃ দীপান্তরিত ও সাজা প্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের কেন্দ্র করে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা গড়ে তুলল বন্দী মুক্তি আন্দোলন। যার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু এ্যান্ডুজ এর মত মানুষেরা। মেয়েদের তথা রাজনৈতিক বন্দী মেয়েদের দীপান্তরিত করা যাবে না। মূলত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি। গীতা মুখার্জীর কথায়, ''মনে পড়ে একটা গরমের ছুটির পর স্কুল খুলল.....রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ছেলে চেঁচাচ্ছে -- আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। তাঁরা বক্তৃতা করছিলেন আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবী করে, মর্মস্পর্শী বিবরণ দিচ্ছিলেন কি ভাবে তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ..... আন্দোলনের এবং অত্যাচারের চিত্রকল্প বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। অনুভব করি আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন আমরাও স্কুলে ধর্মঘট করলাম। এই ভাবে প্রথম নামলাম সক্রিয় ভাবে আন্দোলনের ময়দানে। অন্তরের টানে, স্বদেশের টানে। [৪৯] এভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের

তথা ছাত্রীদের নিজেদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের কাজ শুরু হয়। এরপর প্রকাশিত হয় মেয়েদের কাগজ ''মন্দিরা'' বাংলার এই সব মেয়েদের মুক্তির দাবীতে এন্ড্রুজের মত মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন দেখা করেন গভর্ণর এর সাথে, রবীন্দ্র নাথা ঠাকুর দেখা করেন গভর্ণর এর সাথে আবার এরা টাউন হলের জনসভায় সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের আপামর জনগণকে আহ্বান করেন যা উপস্থিত জনতার সাথে সাথে দেশবাসীকেও গভীর ভাবে প্রভাবিত করে এর ফলে গান্ধীজী সহ সমগ্র কংগ্রেস এই আন্দোলনে সামিল হয়। এই মেয়েরা দলমত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীকে একটি দাবিতে সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিল। একই সাথে মুক্ত করতে পেরেছিল নারীদের তাদের গৃহকোণ থেকে। এই সব ছাত্র ছাত্রীরা সচেতনতা প্রচার-প্রসার করতে পেরেছিল গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে। একই সাথে ঘটিয়েছিল নারী মুক্তি যেখানে এই বিপ্লবী নারীরা কাজ করেছিল প্রবল সক্রিয় পরোক্ষ অনুঘটকের। রেণু চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই আন্দোলনে ''নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মেয়েরা এই বন্দী মুক্তি আন্দোলনে একত্র সমবেত হলেন। ৯৮ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা অফিস খোলা হল। ওখান থেকেই মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আদোলন সংগঠিত করতেন। একত্র হয়ে সকলে মিলে কংগ্রেস মহিলা সংঘ গড়ে তুললেন। ওতে ছিলেন শ্রীসংঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীণা দাশ ও কমলা দাশগুপ্ত, যুগান্তরের ভূতপূর্ব কমলা চ্যাটার্জী যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। এবং আরও নানা মতের মেয়েরা। সম্মিলিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক মহিলা কর্মীরাই ছিলেন এর পুরোভাগে।[৫০] দলত নির্বিশেষে এই মেয়েরা একটি নির্দিষ্ট দাবীতে সংগঠিত হয়ে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ধারার নারী আন্দোলন। বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন সৃষ্টি করল নতুন ঘরানা যা পরে ভিন্ন ভিন্ন খাতে ও ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে সমৃদ্ধ করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে ভারতীয় রাজনীতিকে, সচেতন করে ভারতীয় সমাজকে।

তথ্য ও সূত্র নির্দেশিকা ঃ–

১. ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত; করাচি; ১৬/৬/৬৪; নেওয়া হয়েছে কমলা দাশগুপ্ত; *রক্তের অক্ষরে*; কলকাতা; শ্রাবণ ১৩৫১; আগষ্ট ১৯৫৪; পৃ - পরিচিতি

১ক. কল্পনা দত্ত; *চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা*; কলকাতা; জানুয়ারি ১৯৪৬; পৃ-২১

২. তদেব; পৃ - ২১

৩. তদেব; পৃ - ২১

৪. তদেব; পৃ - ২২

৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; *পলাশী থেকে পার্টিশান; আধুনিক ভারতের ইতিহাস*; কলকাতা; ২০০৬; পৃ - ৩৮৫

৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল; *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ নারী*; বিশ্বভারতী; কলকাতা; ১৩৬১ ভাদ্র; পৃ - ৪০

৭. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৪

৮. সরোজ মুখার্জী; *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*; প্রথম খণ্ড; কলকাতা; ১৯৮৯; পৃ - ১২৩

৯. অমৃতবাজার পত্রিকা; ৩ আগষ্ট; ১৯৩৭; কলকাতা

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. *অমৃতবাজার পত্রিকা*; ১৫ আগষ্ট; ১৯৩৭; কলকাতা
১৫. *অমৃতবাজার পত্রিকা*; ১৮ আগষ্ট; ১৯৩৭; কলকাতা
১৬. *অমৃতবাজার পত্রিকা*; ২৯ আগষ্ট; ১৯৩৭; কলকাতা
১৭. *অমৃতবাজার পত্রিকা*; ২৯ আগষ্ট; ১৯৩৭; কলকাতা
১৮. যোগেশ চন্দ্র বাগল; প্রাগুক্ত; পৃ - ৪০
১৯. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৪
২০. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৪
২১. প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৫
২২. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৫
২৩. অমৃতবাজার পত্রিকা; ১৪ মার্চ; ১৯৩৮; কলকাতা
২৪. অমৃতবাজার পত্রিকা; ১৫ মার্চ; ১৯৩৮; কলকাতা
২৫. বীণা দাশ; প্রাগুক্ত; পৃ - ৫৮
২৬. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ১০১
২৭. কমলা দাশগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ১০৬
২৮. প্রাগুক্ত; পৃ - ১০৬
২৯. প্রাগুক্ত; পৃ - ১০৬
৩০. প্রাগুক্ত; পৃ - ১০৬
৩১. বীণা দাশ; প্রাগুক্ত; পৃ - ৬৮
৩২. আগমনী লাহিড়ী, বিজয়কুমার নাগ; শিখাময়ী লীলা রায়; কলকাতা; ২৩ জানুয়ারী ১৯৯৯; পৃ - ৩৯
৩৩. মণিকুন্তলা সেন; *সেদিনের কথা; কলকাতা;* পৃ - ৫১
৩৪. রেণু চক্রবর্তী; ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা; কলকাতা; পৃ - ৮ - ৯
৩৫. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৩৯
৩৬. Sl No - 99/17; File No - 321/17; Home/Pol/Confidential; An account of the revolutionery organization in eastern Bengal with refference to the Dhaca Anushilan Samity; WBSA.
৩৭. প্রাগুক্ত; পৃ - ৯৬
৩৮.
৩৯. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; *শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ*; কলকাতা; ১৯৫৬; পৃ - ৩৪৭
৪০. পুলিন বিহারী দাস; *আমার জীবন কাহিনী*; কলকাতা ১৯৮৭; পৃ - ৩০০
৪১. কমলা দাশগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ১৭
৪২. প্রাগুক্ত; পৃ - ১৭
৪৩. প্রাগুক্ত; পৃ - ২২
৪৪. কল্পনা দত্ত; প্রাগুক্ত; পৃ - ৬৯
৪৫. বীণা দাশ; প্রাগুক্ত; পৃ - ৩৫
৪৬. প্রাগুক্ত; পৃ - ৩৫
৪৭. প্রাগুক্ত; পৃ - ৩৭
৪৮. Geraldine Forbes; Ibid; P - 155.
৪৯. সুস্নাত দাশ; প্রাগুক্ত; পৃ - ৫৫ - ৫৬
৫০. রেণু চক্রবর্তী; *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা*; পৃ - ৮ - ৯